যে পথে ফুল ঝরে

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বানানো কথা এবং মিথ্যে কথার মধ্যে তফাত কী? এই প্রশ্নটাই এখন বিরাট সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে এমিলির কাছে। বানানো, অর্থাৎ, মনগড়া কথা বলা এমিলির ছোটবেলার অভ্যাস। মা বলেন, তখন যে মিসরা পড়িয়েছিলেন এমিলিকে, তাঁদের একটাই কমন কমপ্লেন ছিল যে, নিজের মনে বকবক করে এমিলি। বকবকটা কীরকম? এমিলি হয়তো বইয়ে টিয়াপাখির ছবি দেখিয়ে মিসকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কী পাখি, মিস?" মিস বললেন, "টিয়াপাখি, জঙ্গলে থাকে।" এমিলির বকবক শুরু হয়ে গেল, "একটা টিয়াপাখির ছানা রোজ আমাদের বারান্দার রেলিংয়ে এসে বসে। আমি ওকে বিস্কুট খেতে দিই। কাকগুলো টিয়াপাখির ছানাটাকে খুব জ্বালায়। আমি কাকগুলোকে তাড়িয়ে দিই। একদিন টিয়াপাখির ছানার মা এল আমাদের বারান্দায়। ছানাটাকে বকল, 'রোজ-রোজ তুই এখানে এসে জলখাবার খাস, আর আমি তোকে খুঁজে মরি...' "

"অ্যাই, তুই থামবি!"

মিসের বকুনিতে থেমে যেত এমিলি। কোনওদিন হয়তো নদীতে নৌকোর ছবি দেখিয়ে এমিলি মিসকে জিজ্ঞেস করত, "নৌকোটা কোথায় যাচ্ছে, মিস?"

"কোথাও একটা যাচ্ছে, আমি কী করে জানব!" বললেন মিস। এমিলি বলতে শুরু করল, "এই নৌকো করে আমি, বাবা, মা, ভাই দার্জিলিং যাচ্ছি। গরমের ছুটি পড়েছে আমাদের..."

মিস যত বোঝাচ্ছেন, "ওরে, নৌকো করে কেউ দার্জিলিং যায় না। ট্রেন আছে, বাস আছে..." এমিলি কিছুতেই সেকথা শুনবে না। নৌকো চেপে দার্জিলিং যাওয়ার বর্ণনা করেই যাচ্ছে। প্রসঙ্গের বাইরে এসব বকবকানিতে মিসরা বিরক্ত হতেন। মা-ও ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখতেন না। এমিলি বড় হতে-হতে উচ্চারণ করে বকবক করাটা ছেড়ে দিল। যে-কোনও একটা সূত্র ধরে গল্প বানাত মনে-মনে। মাঝে-মাঝে সেইসব গল্প মা কিংবা ভাইকে শোনাত। যেমন শ্যামবাজারে পুজোর জামাকাপড় কিনতে গিয়েছে। মা ড্রেস পছন্দ করতে ব্যস্ত। এমিলি এসে মায়ের কানে-কানে বলল, "শো-কেসের

পুতুলটার চোখের পাতা পড়ছে, এটা জ্যান্ত। মেয়েটার সঙ্গে আমার কথাও হল। ওর বাবা খুব গরিব। মেয়েকে চাকরি করতে দিয়ে গিয়েছে এখানে।"

দোকানে একগাদা লোকজনের মাঝে মা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "মারব ঠাস করে এক চড়! গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে যাবে..."

এই ঘটনা সম্ভবত ক্লাস ফোর-ফাইভের। তখনও অবশ্য ভাইকে গল্প বানিয়ে বলা যেত। চোখ বড়-বড় করে আগ্রহভরে শুনত পিকলু। এখন আর শুনতে চায় না।

কিন্তু মনের মধ্যে চলতে থাকা এক্সাইটিং গল্পগুলো কাউকে তো একটু বলতে ইচ্ছে করে। শেয়ার না করলে মজাটা পুরোপুরি উপভোগ করা যায় না।

এই তো সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে মণ্ডলপাড়ার দিকে তাকাতেই মনের মধ্যে একটা ক্যামেরা চালু হয়ে গেল। শুনশান গলি। বেশ কয়েকটা বাগানওয়ালা বাড়ি আছে। গাছের ডালপালা পাঁচিল বিছিয়ে রাস্তাকে ছায়া দিচ্ছে। এও একধরনের ছায়াপথ। ডাক্তারবাবুর বাগানের ছাতিমগাছটা ফুলে ভরে আছে। রাস্তাতেও পড়ে রয়েছে গুঁড়ো-গুঁড়ো সাদা ফুল। এরপরই এমিলি দেখতে শুরু করে, সে আর সামাদা ওই গাছতলা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। তাদের ঘিরে রয়েছে ছাতিমের ঘোর-লাগা গন্ধ। খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর এমিলি সামাদার মাথার দিকে তাকায়। হাসতে-হাসতে বলে, "তোমার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হয়েছে!" যদিও বাস্তবে সে সামাদাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করে।

এমিলির চুলে চোখ বুলিয়ে সামাদা বলল, "তোমার মাথায় তো ভর্তি হয়ে গিয়েছে ফুলে!"

"ও মা! তাই?" বলে মাথা থেকে ফুল ঝাড়তে যাচ্ছিল এমিলি, সামাদা বাধা দিয়ে বলে উঠল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, ফেলো না। তোমার মাথার ফুলগুলো আমায় দাও, আর আমারগুলো তোমার কাছে রাখো। আমাদের জুটিকে দেওয়া প্রকৃতির ওই শুভেচ্ছা আমরা একে অপরকে গিফ্‌ট করব। এর চেয়ে সুন্দর উপহার আর কী হতে পারে!"

বাস এত অবধি কল্পনা করতে পেরেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল এমিলির। রোমাঞ্চটা শেয়ার করতে ইচ্ছে হয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে। পরেরদিনই স্কুলে গিয়ে ওদের সাতজনের যে কোর গ্রুপটা আছে, মণ্ডলপাড়ার গলির কল্পনাটা তাদের কাছে সত্যির মতো করে বলে। শুনে তো ওরা ফ্ল্যাট। কেউ বলল, "হাউ সুইট!" কেউ বা বলল, "তুই কী লাকি রে! হিংসে হয় তোকে..." মোনালিসা বলল, "প্লিজ সামাদার মোবাইল নম্বরটা দে না। বাবাকে দিয়ে কথা বলাব। আমিও পড়ব সামাদার কাছে... আই সোয়্যার, আর কিছু করব না।"

এমিলিও শুধুই টিউশনই পড়ে। বাড়ি এসে ইংলিশ সাবজেক্ট পড়ায় সামাদা। আজ পর্যন্ত এমিলি নিজের মনের কথা সামাদাকে জানাতে পারেনি। কল্পনার জগতে ও যতটা স্বচ্ছন্দ, বাস্তবে ঠিক ততটাই আড়ষ্ট। তবু সামাদার সামনে এমিলির চোখমুখের মুগ্ধতা নিশ্চয়ই ফুটে ওঠে। কিন্তু তিনি আবার সিলেবাসের ব্যাপারে এতটাই সিরিয়াস, এমিলির মুখটা পড়ার ফুরসত তাঁর আর হয় না। কিন্তু কেন যেন এমিলির মনে হয়, সামাদা তাকে বিশেষভাবে পছন্দ করে। এই অনুমানের সপক্ষে কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই এমিলির কাছে। হয়তো এটাও তার কল্পনা। সম্পর্কটার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে সামাদা এক সেন্টিমিটারও এগিয়ে আসেনি। এগোতে দেয়নি এমিলিকেও। সেদিন হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে ঝুপ্পস হয়ে তাকে পড়াতে এল সামাদা। এমিলি দৌড়ে এসেছিল তোয়ালে নিয়ে। ইচ্ছে ছিল মাথাটা মুছিয়ে দেওয়ার। সুযোগ দিল না সামাদা। হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে ঢুকে গেল ভাইয়ের ঘরে। পিলুর বাড়ি ছিল। বাবার পায়জামা-পাঞ্জাবি বের করে দিল সামাদাকে। সেসব পরে চুল আঁচড়ে পড়াতে বসেছিল সামাদা।

এমিলি ঘটনাটাকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে বর্ণনা করল বন্ধুদের কাছে। বলল, তোয়ালে দিয়ে সামাদার চুল মুছিয়ে দিয়েছে সে। ভিজে টি-শার্ট, গেঞ্জি খুলিয়ে পরিয়ে দিয়েছে বাবার পাঞ্জাবি। নেহা বলেছিল, "তুই যে ওর অত কাছে গেলি, ভিজে শরীর... কীরকম ফিলিং হচ্ছিল তোর?"

"অদ্ভুত একটা মাতাল করা গন্ধ পাচ্ছিলাম, যেন চন্দনের বনে ঝোড়ো হাওয়া এসে পড়েছে।" উপমাটা শোনার পর বন্ধুরা একসঙ্গে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, তা প্রায় ঝড়েরই শামিল।

এইসব মনগড়া কথা বলার নেশায় এমিলি যে কখন খাদের ধারে এসে পড়েছে, খেয়ালই নেই। বন্ধুরা আলাপ করতে চাইছে সামাদার সঙ্গে। চাওয়ার সঙ্গত কারণও আছে। পাঁচ বন্ধু তাদের বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আলাপও করিয়েছে সকলের। শপিং মলের ফুডকোর্টে খাওয়া, মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখা, সবই হয়েছে। তা হলে এমিলিই বা কেন তার সামাদার সঙ্গে বাকিদের আলাপ করাবে না? তা ছাড়া খোদ এমিলিরই পরোক্ষ প্ররোচনাতেই ওরা সামাদার সঙ্গে দেখা করতে

এত উৎসাহী। একসঙ্গে সামাদা আর এমিলির ফোটো দেখেছে ওরা। বাড়ির সরস্বতী পুজোয় গ্রুপে তোলা ছবি থেকে দু'জনের ফোটো স্টুডিয়োয় গিয়ে আলাদা করিয়ে নিয়েছিল এমিলি। ছবিটা বন্ধুদের দেখাবে বলেই ফোটোটা তোলার সময়ই মাথাটা হেলিয়ে রেখেছিল সামাদার ঘাড়ের কাছে। 'না সাজা' সাজেই সামাদাকে দারুণ রূপবান লাগে। সম্ভবত সামাদা নিজেও সেটা জানে। তাই কখনও তাকে ফিটফাট ড্রেসে দ্যাখেনি এমিলি। লম্বা, ছিপছিপে চেহারা, কাটা-কাটা চোখ-নাক-মুখের সামাদার ছবি দেখে বন্ধুরা ফিদা। তার সঙ্গে ওরা যোগ করে নিয়েছে এমিলির বলা রোমান্টিক গল্পগুলো... সব মিলিয়ে সামাদার সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ তো বাড়বেই। এমিলির সৌন্দর্যকেও বন্ধুরা অগ্রাহ্য করতে পারছে না।

ফোটোটা দেখে সেই কারণেই শ্রেয়া বলে উঠেছিল, "তোরা তো দেখছি 'রব নে বনাদি জোড়ি'!" বাকিরা হইহই করে সমর্থন করেছিল। শ্রেয়া ছেলেদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ওর বয়ফ্রেন্ড ডিচ করেছে ওকে। সেই শ্রেয়াও সামাদাকে একবার দেখার জন্য ব্যাকুল। কোনও না কোনওভাবে এতদিন ওদের নিরস্ত করে এসেছে এমিলি। তবে আর ওদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সামনে এমন একটা ইভেন্ট আছে, যেখানে সব বন্ধুর বয়ফ্রেন্ডরাও আসবে। স্বাভাবিকভাবেই এমিলিরও উচিত সেই অনুষ্ঠানে সামাদাকে নিয়ে যাওয়া। যেতে না পারলে তার এতদিনের সমস্ত কথা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে। খুব তাড়াতাড়িই বন্ধুদের কাছে মিথ্যেবাদী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবে এমিলি।

ইভেন্টটা হচ্ছে স্কুলের ৫০ বছরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। কাল বাদ পরশু রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠান। এমিলির যেহেতু টুয়েল্‌ভ, তাই ব্যবস্থাপনার দায়িত্বেও তারাই। প্রত্যেক স্টুডেন্টের পাওনা একটি করে গেস্ট কার্ড। টুয়েলভের যেসব ছাত্রীদের বয়ফ্রেন্ড আছে, তারা বাড়তি একটি করে কার্ড সরিয়ে রেখেছে। এমিলি নিজের বাড়তি কার্ডটা নিয়ে পড়ার ঘরে বসে রয়েছে। খানিকক্ষণ বাদেই পড়াতে আসবে সামাদা। এমিলি কি তাকে কার্ডটা দিয়ে বলতে পারবে অনুষ্ঠানে আসার কথা? চার মাস আগে হলে পারত। খুব করে রিকোয়েস্ট করলে সামাদা হয়তো গিয়ে পৌঁছে যেত স্কুলের ফাংশনে। তারপর ওর বন্ধুরা সামাদাকে ঘিরে যেসব কথা বলত, তাতে সামাদার বুঝতে অসুবিধে হত না, এমিলি তার কী পরিচয় দিয়েছে। তাতে একদিক থেকে ভালই হত। এমিলি যে কথা মুখ ফুটে সামাদাকে বলতে পারছে না, অনাভাবে জানানো হয়ে যেত। কিন্তু গত চারমাস ধরে পরিস্থিতি এমন দিকে গড়িয়েছে যে, সামাদাকে স্কুলের অনুষ্ঠানে আসার রিকোয়েস্ট করার মতো মনের জোর পাচ্ছে না এমিলি। বাবা চার মাস হল সামাদার টিউশন ফি দিতে পারেনি। অফিস থেকে স্যালারি পাচ্ছেন না। ইউনিয়ন-মালিকপক্ষের মধ্যে কীসব ঝগড়াঝাঁটি চলছে। বাবা নিজের অসুবিধের কথা সামাদাকে জানিয়েছেন। এখনও যে সামাদা পড়িয়ে চলেছে, এটাই তো বিরাট অনুগ্রহ। এরপর স্কুলের ফাংশনে আসতে বলাটা প্রায় ন্যাকামির পর্যায়ে চলে যায়। কোন মুখে বলবে এমিলি?

এমিলি শখ-আহ্লাদ করা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। সংসারে যাতে কোনও অপচয় না হয়, সেদিকে সর্বক্ষণ নজর রাখে। বিনা দরকারে আলো-পাখা

চললেই সুইচ অফ করে দেয়। ভাবে তার এই তৎপরতায় যদি কিছু সাশ্রয় হয়, বাবা সাম্যদাকে অন্তত এক মাসের ফিজ় দিতে পারবে।

এখনও পর্যন্ত পারা যায়নি। সাম্যদা নিয়ম করে সপ্তাহে দু'দিন এসে পড়িয়ে যাচ্ছে। একদিনের জন্যেও এমিলিকে ফিজ়ের ব্যাপারে কিছু বলেনি। যে কোনওদিনই আসা বন্ধ করে দিতে পারে সাম্যদা। কিছুই বলার থাকবে না এমিলির। কেন যে বন্ধ করছে না আসা, সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের। তাহলে কি এমিলির প্রতি কোনও দুর্বলতা আছে সাম্যদার? আভাস ইঙ্গিতেও কখনও সেটা বুঝতে দেয়নি। গম্ভীরমুখে ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'সলিটারি রিপার', কিটসের 'টু ওয়ান হু হ্যাজ় বিন লং ইন সিটি পেন্ট', এডওয়ার্ড থমাসের 'আউল' কবিতাগুলো ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে। গলাটা রহস্য-রহস্য করে নিয়ে ওয়ালটার ডে লা মেয়ারের কবিতা 'দ্য লিসনার্স' উচ্চারণ করছে, " ইজ় দেয়ার এনিবডি দেয়ার..." ঠিক এভাবেই এমিলি সাম্যদার কাছে মনে-মনে জানতে চায়, 'আমি কি তোমার অন্তরে আছি? আছি কি অন্তরে?'

॥ ২ ॥

এমিলিকে পড়ানোর জন্য সাম্য যখন বাড়ি থেকে বেরোল, ওর ভুরু জোড়া প্রায় হাত ধরাধরি করে আছে। যথেষ্ট ভদ্রতা হয়েছে, আজ এমিলিকে মাইনের ব্যাপারটা বলবে। পরিষ্কার জানিয়ে দেবে, 'বিনা টাকায় আমার পক্ষে আর পড়ানো সম্ভব নয়। সামনের দিন থেকে আসছি না। বাবাকে বলবে পাওনা টাকা বাড়িতে দিয়ে আসতে।'

এত অপ্রিয় কথা বলার ছেলে সাম্য নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ফিজ়-এর প্রসঙ্গ তুলতেই সে কুণ্ঠা বোধ করে। যা আজকালকার দিনের প্রাইভেট টিউটররা প্রায় কেউ করেই না। স্টুডেন্টকে পড়ানোর কথা পাকা হয়ে গেলেই, মাইনের ডেটটা ফিক্সড করে নেয়। ফিজ় দিতে একদিন দেরি হলেই নক করে স্টুডেন্টকে, "কী রে, বাড়ি থেকে টাকা দিয়েছে, দিতে ভুলে যাচ্ছিস নাকি?" টিচারদেরও দোষ দেওয়া যায় না। প্রাইভেট টিউটরদের মাইনে দেওয়ার ব্যাপারে অনীহা বাঙালির পুরনো ঐতিহ্য। দীর্ঘদিন সহ্য করার পর এখন শিক্ষকরা সোচ্চার হয়েছেন। অনেকেরই সংসার খরচ চলে ওই টাকায়। সাম্যকে অবশ্য বাড়িতে একটা টাকাও দিতে হয় না। চারটে টিউশন পড়ায়। হাত খরচ বাদেও জমে যায় কিছু। তার মানে তো এই নয়, মাসের পর মাস একজনকে সে বিনা পারিশ্রমিকে পড়িয়ে যাবে! ধার করে অথবা অন্য কোনওভাবে এমিলির বাবা তো সংসারটা টেনে যাচ্ছেন। শুধুমাত্র সাম্যর টাকাটা দিতে এত সমস্যা হচ্ছে কেন? যতদিন যাচ্ছে সাম্যর কেন যেন মনে হচ্ছে, এমিলির ফ্যামিলি তাকে ইউজ় করছে। নিজেকে ব্যবহৃত হতে দেওয়ার চেয়ে আত্মঅবমাননাকর আর কিছু নেই। সন্দীপদার পরামর্শ এই সময় খুব মনে পড়ছে। সাম্যদের এলাকার বিখ্যাত ইংলিশ টিচার সন্দীপদা। সাম্যও উচ্চ মাধ্যমিকের সময় থেকে গ্র্যাজুয়েশন অবধি সন্দীপদার কোচিং-এ নিয়েছে। সাম্য যখন এম এ-তে ভর্তি হল, টিউশনির প্রস্তাব আসতে লাগল তার কাছে। পড়ালে নিজের পড়ার ক্ষতি হবে কি না, জানতে গিয়েছিল সন্দীপদার কাছে। উনি বলেছিলেন, "চর্চার মধ্যে থাকলে তোর পড়াশোনার উন্নতিই হবে। বাড়ি গিয়ে পড়া, উঁচু দর হাঁকিস, রেপুটেশনের দিকে নজর রাখিস। প্রাইভেট টিউটরের রেপুটেশনটাই সব। ওটা একবার গেলে বাজার বসে যাবে।"

"কী ধরনের রেপুটেশনের কথা বলছেন?"

জিজ্ঞেস করেছিল সাম্য।

সন্দীপদা বলেছিলেন, "সব ধরনের রেপুটেশন, মন দিয়ে পড়ানো। ডুব না মারা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, স্টুডেন্ট ছাত্রী হলে তার প্রেমে না পড়া। প্রেম আর পেশা গুলিয়ে ফেললেই তোমার টিউশনির বাজার দফারফা।"

হেসে ফেলেছিল সাম্য। সন্দীপদাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা, শিক্ষক-ছাত্রীর প্রেমটা চিরকালই এত কমন ব্যাপার কেন বলুন তো?" সন্দীপদা স্বভাবসিদ্ধ কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেছিলেন, "প্রেম তো আসলে এক ধরনের ভাইরাস। পড়ানোর সময় প্রাইভেট টিউটর ছাত্রীর মধ্যে দূরত্ব মাত্র দেড়-দু'হাতের। তাই সংক্রমণের চান্স বেশি। ভাইরাস চোখে দেখা যায় না। কখন সংক্রামিত হলি, টেরই পাবি না। লেখাপড়ার বাইরে কোনও কথা বলবি না ছাত্রীদের সঙ্গে..."

সাম্যর চারজন স্টুডেন্টই হায়ার সেকেন্ডারির। দু'টো ছেলে, দু'টো মেয়ে। রচনা একেবারে বাচাল, লেখাপড়ার বাইরের কথাই বেশি বলে। তবে প্রেম নিবেদনের ধার মাড়ায় না। এমিলি সে তুলনায় অনেক শান্ত। কথা কম বলে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সাম্যর দিকে। মুগ্ধতাটা সাম্যর পড়ানোর কারণে, নাকি সরাসরি সাম্যর প্রতি... আজও বুঝে ওঠা গেল না।

সম্প্রতি সাম্যর সন্দেহ হচ্ছে এক্সপ্রেশনটা আসলে ভান। মাইনে দেওয়া বন্ধ করেছে বাবা, এমিলির মুগ্ধতা ক্রমশ বেড়েছে। সন্দেহ এখন এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে সাম্যর, এমিলির বাবার অফিসে গিয়ে খোঁজ করতে ইচ্ছে করছে, গন্ডগোল আসলে ঠিক কতটা? একটা মাস মাইনে না দিতে পেরে ভদ্রলোক সেই যে একবার সাম্যকে সংকোচের সঙ্গে বলেছিলেন, "অফিসে গোলমাল চলছে। মাইনে হয়নি। এমাসের মাইনেটা তোমায় সময়মতো দিতে পারলাম না। সমস্যা মিটে গেলেই দিয়ে দেব।" তারপর থেকে আর সাম্যর মুখোমুখি হননি। অথচ এই মানুষটা বছরখানেক আগে সাম্যকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে প্রায় ইন্টারভিউ নিয়ে মেয়েকে পড়ানোর জন্য রিক্রুট করেছিলেন। বাড়িতে ডেকে পাঠানোর কারণে সাম্য টিউশন ফি বেশ উঁচুর দিকেই হেঁকেছিল! তাতেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন এমিলির বাবা। প্রথম দিনেই অবশ্য সাম্যকে 'হ্যাঁ' বলেননি। পাড়ায় বাড়ি কিনে নতুন এসেছেন, সাম্যর সম্বন্ধে খোঁজখবর করে নিয়েছিলেন। তাতে অবশ্য অন্যায়ের কিছু নেই। সাম্যদের এলাকার ইতিহাসে এমিলির মতো স্নিগ্ধ সুন্দরীদের দেখা খুব কমই পাওয়া গিয়েছে। ফলে ওর গার্জেনরা তো বেশি সজাগ হবেই।

এখনও অবধি সাম্য ওঁদের মান রেখেছে। ওঁরা বরং সাম্যর প্রাপ্য মর্যাদা দিচ্ছেন না। ও বাড়িতে পড়ানো শুরু করতেই পাড়ার বন্ধুরা বলেছিল, "বস, পাখি দাঁড়ে বসতে না বসতেই শিকল পরিয়ে দিলে! পড়ানোর জন্য টাকা-পয়সা নিচ্ছ না তো? জানো, ক্যাটরিনা-সোনাক্ষীর প্রাইভেট টিউটররা পড়ানোর জন্য কোনও টাকা নিত না। সুন্দরীদের টিউশন ফি নেওয়া মহাপাপ।"

এই ঠাট্টার পিছনে অশ্লীল ইঙ্গিত আছে। সেই কারণে সাম্য এখনও বন্ধুদের বলতে পারেনি মাইনে না নিয়ে পড়িয়ে যাচ্ছে এমিলিকে। বাড়িতেও জানে না, একজনকে ফ্রিতে পড়িয়ে যাচ্ছে সাম্য। ফ্রি সার্ভিসের ব্যাপারটা জানে শুধু এমিলির বাড়ির লোক আর সাম্য। ওদের বাড়ির লোক ভাবছে ছেলেটা বেকুব। মেয়ের সান্নিধ্যের আশায় এখন বিনা পয়সায় পড়িয়ে যাবে মাসের পর মাস। এমিলিও ভেবেছে, তার মোহমুগ্ধ দৃষ্টিটাই পড়ানোর পারিশ্রমিক।

আজ শেষ দিন। তার ভদ্রতাকে দুর্বলতা ধরে নেওয়াটা সে আর বরদাস্ত করবে না।

সপ্তাহের দু'টো দিন, সোম আর বৃহস্পতি বিকেলের দিকটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে সাম্যর। মিস করবে এমিলির বাড়ির পরিবেশ। মিস করবে এমিলিকেও। ওর স্নিগ্ধ উপস্থিতি এবং সাম্যর প্রতি বিমুগ্ধ অ্যাটেনশন, ওদের বাড়ির লোকেদের আন্তরিক আপ্যায়ন, এগুলো জীবন থেকে চলে যাবে। নিজের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সপ্তাহের এই দু'টো দিনের জন্য সে বিশেষ অপেক্ষায় থাকত। এমিলির দৃষ্টি দেখতেও প্রশান্তি, পথ চেয়ে থাকার অবসান। সপ্তাহের দু'টো দিন বিকেল হলে খচখচ করবে মনটা। এমিলিদের বাড়ির দরজায় চলে এসেছে সাম্য। ডোরবেলটা বেশিক্ষণ ধরে টিপে রাখে। আজকের চড়া মেজাজের আভাসটা প্রথম থেকেই দিয়ে দেয়। পড়ানো শেষ পর্যায়ে। সাম্য এখনও কথাটা বলে

উঠতে পারেনি। বলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমিলি অন্যান্য দিনের মতোই ছোট খাটটায় ছড়ানো বই খাতার মাঝে বসে রয়েছে। সামা কাঠের চেয়ারটায়। এমিলিকে আজ যেন একটু অন্যমনস্ক আর অস্থির লাগছে। গলা ঝেড়ে নিয়ে কথাটা বলতে যাবে থমকে যায়, দেখে, এমিলি খাতার মধ্যে থেকে একটা খাম বের করছে। টাকার খাম? ফিজটা কি দেবে আজ? এমিলি কখনও দেয় না। ওর বাবা অথবা মা দেন।

না টাকার খাম নয়। কোনও কার্ড আছে মনে হয়। এমিলির বাড়িতে ধরা খামটা হাতে নেয় সামা। জিজ্ঞেস করে, "কী?"

উত্তর দেয় না এমিলি। দৃষ্টিটা কেমন করুণ। খাম থেকে কার্ডটা বের করে পড়ে সামা বলে, "আমি এটা নিয়ে কী করব?"

এমিলি ঝপ্ করে সামার দু'টো হাত ধরে নেয়। আকুল গলায় বলে, "তোমাকে আসতে হবে স্কুলের ফাংশনে।" এমিলির আঁকড়ে ধরা হাতটার দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থাকে সামা। এক চিলতে বিজয়ের হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁটে। নিজের হাতটা এমিলির হাত থেকে সরিয়ে নিতে-নিতে বলে, "তোমার বাবা মনে হচ্ছে এমাসেও আমার ফিজটা দেবেন না।"

কার্ডটা বিছানায় ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে সামা। বড়-বড় পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এমিলির মনে হচ্ছে কার্ড নয়, তাকেই যেন বরফের চাঁইয়ের উপর ফেলে দিয়ে গেল সামাদা। সারা শরীর ঠান্ডায় অবশ হয়ে আসছে। যে ইঙ্গিতটা করে গেল সামাদা, তার মানেটা পরিষ্কার। এমাসে বাবা টাকা দিতে পারবে না বলে এমিলি সামাদার হাত ধরেছে। সামনের মাসে টাকা না দিতে পেরে জড়িয়ে ধরবে। পরের মাসে ডিফল্ট থাকলে... আর ভাবতে পারছে না এমিলি। কান্না পাচ্ছে ভীষণ। কাঁদতেও পারছে না এমিলি। বরফের ঠান্ডায় চোখের জলও জাম হয়ে গেল বোধ হয়।

॥ ৩ ॥

স্কুলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান বেশ কিছুক্ষণ হল শুরু হয়েছে। বন্ধুদের বয়ফ্রেন্ডরা এসেছে সকলেই। সামাদা না আসার অজুহাত হিসেবে এমিলি বলেছে, "আসার খুব ইচ্ছে ছিল রে ওর। আজ সকালে কাকার অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর শুনে শ্রীরামপুরে গিয়েছে। চিন্তা করিস না, খুব তাড়াতাড়িই তোদের সঙ্গে মিট করাব।"

বন্ধুরা হতাশ হয়েছে খুব।

বন্ধুদের সঙ্গে আর কোনওদিনই আলাপ করানো হবে না সামাদার। প্রেমটা যেমন বানিয়ে বলেছিল এমিলি, প্রেম ভেঙে যাওয়ার গল্পটাও বানাবে। সামাদা আর কখনও পড়াতে আসবে না। যদি আসেও ওর কাছে পড়বে না এমিলি। তার স্বপ্ন চুরমার করে দিয়ে চলে গিয়েছে সামাদা। বাবার অফিসে মাইনে হলেই বাবাকে বলবে সামাদার টাকাটা আগে মিটিয়ে দিয়ে আসতে। সামাদাকে মন থেকে মুছে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করবে এমিলি। ভাববে, সামাদা বলে কেউ নেই। ওটা একটা কল্পনা মাত্র।

এমিলি এখন স্টেজে, পুরস্কার ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের নির্দিষ্ট বই বেছে রাখছে। বই নিতে এসে পল্লবী হঠাৎ চাপা উত্তেজনায় এমিলিকে বলল, "তোর সামাদা এসেছে মনে হচ্ছে রে। সেকেন্ড রো-এর দিকে। যে ফোটোটা দেখিয়েছিলি, তার সঙ্গে ভীষণ মিল। বসার জায়গা পায়নি। দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

হ্যাঁ, ঠিক চিনেছে পল্লবী। সামাদাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাসছে এমিলির দিকে তাকিয়ে। হেসেই যাচ্ছে সামাদা। এমিলি কষ্ট করে হাসে। এমিলির ম্লান হাসিটা দেখে খারাপ লাগে সামার।

পরশু খুব রূঢ় ব্যবহার করা হয়ে গিয়েছে ওর সঙ্গে। জলাব অবশ্য বাইরে এসেই পেয়েছিল সামা। এমিলির বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা এগোতেই মুখোমুখি হয়েছিল এমিলির বাবার। সলিলবাবু শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠেছিল, "ওঃ তুমি চললে। এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল!"

মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল সামার। বলতে যাচ্ছিল, 'ফিজ দিতে পারছেন না সময়ের হিসেব করছেন! ... বলতে হয়নি। সামার মুখ দেখে মনের কথা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন সলিলবাবু। দ্বিধা সংকোচের সঙ্গে বলেছিলেন, "তোমার সঙ্গে একটা দরকার ছিল। সেটা বাড়িতেই বলব বলে তাড়াতাড়ি ফিরছিলাম। এখানে ঠিক..."

"কী দরকার?" জানতে চেয়েছিল সামা।

ভদ্রলোক অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে প্যান্টের পকেট থেকে ক'টা একশো টাকার নোট বার করলেন। বাড়িতে গিয়ে এটাকেই হয়তো খামে পুরতেন। বললেন, "তোমার একমাসের ফিজটা কোনও রকমে জোগাড় করেছি। এটা আপাতত নাও। অফিসের গোলমালটা মনে হচ্ছে হপ্তা দু'য়েকের মধ্যে মিটে যাবে। তখন বাকিটা দিয়ে দেব।"

সলিলবাবুকে ওরকম অসহায়, করুণাপ্রার্থীর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খারাপ লাগছিল সামার। বলেছিল, "আমার অত আর্জেন্সি নেই। আমারটা পরেই নেবেন। এটা দিয়ে অন্য জরুরি প্রয়োজন মেটান।"

সলিলবাবুর বেশ কয়েকবার অনুরোধ সত্ত্বেও টাকাটা নেয়নি সামা। বলেছিল, "ফিজটা আপনি দিতে এলেন, আমি নিলাম না, এসব বাড়িতে বলার দরকার নেই। এটা আমাদের মধ্যেই থাক।"

শেষ কথাটা বলার কারণ, যে আঘাতটা সামা খানিক আগে দিয়ে এসেছে এমিলিকে তারপর এই উদারতাটা হাস্যকর শুশ্রূষা ছাড়া আর কিছু নয়। স্কুলের অনুষ্ঠানে এসে ইনভাইটেশনলি এমিলির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে সামা।

অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। অডিটোরিয়ামের বাইরে সামাকে ঘিরে রয়েছে এমিলির বন্ধুরা। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নানা কথা বলে যাচ্ছে, "তোমার কিন্তু হেভি ঘ্যাম, এমিলিকে বলে-বলে তবে আজ আনানো গেল। কত গল্প শুনেছি তোমাদের দু'জনের। রোম্যান্স তোমাদের থেকে শিখতে হয়।"

আরও নানা কথা, ঘটনার অংশ বলে যাচ্ছে ওরা। সবকিছু ঠিকঠাক রিলেট করতে না পারলেও সামার কাছে এতক্ষণে একটা জিনিস ক্লিয়ার, তাঁকে প্রেমিক বানিয়ে বন্ধুদের কাছে অনেকরকম গল্প করেছে এমিলি। সেইসব সামার কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে দেখেও এমিলির কোনও অনুতাপ নেই। দিব্যি হেসে বন্ধুদের কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছে। এমিলির হাসিতে বাবার অফিসে স্যালারি না হওয়ার বিষাদ লেগে নেই এতটুকু।

মিথ্যের চাপ বেশিক্ষণ নিতে হল না সামাকে। এমিলি বন্ধুদের বলল, "এই রে, দেরি হয়ে গেল। আমাকে একবার পিসির বাড়ি যেতেই হবে। আমরা চলি রে।"

'বাই, সি ইউ এগেন' 'বেস্ট অফ লাক' বিনিময় করে সামার কনুই ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে এল এমিলি। বন্ধুরা চোখের আড়াল হতেই হাতটা ছেড়েছে। সামা গম্ভীরভাবে এমিলির পাশে হেঁটে যাচ্ছে। সারপ্রাইজটা এখনও হজম হয়নি।

এমিলি বলে, "আপনি কী আমার উপর খুব রেগে গিয়েছেন?"

"কেন?"

"এই যে, আপনাকে নিয়ে এত মিথ্যে বলেছি বন্ধুদের কাছে।"

"পুরোটাই মিথ্যে? কোনও সত্যি নেই ওর গভীরে?" বুকের ভিতর যেন সমুদ্রের ঢেউ ভাঙল এমিলির। সামাদার মুখে এ কী শুনল সে! হাঁটা থেমে গিয়েছে তার। ভিতর-ভিতর ভীষণ কাঁপুনি শুরু হয়েছে। ঠিক শুনেছে তো, নাকি এটাও তার কল্পনা? সামাদা আবার একই কথা জানতে চায়, "কোনও সত্যি নেই?"

না ঠিকই শুনেছে প্রথমবার। ভিতরের শিহরন এবার বাইরে চলে আসতে চাইছে। এমিলি কোনওক্রমে সামাদাকে বলে, "মণ্ডলপাড়ার গলিটা দিয়ে পাড়ায় ফিরবেন?"

"কেন, অত ঘুরপথে কেন?"

"এমনি ইচ্ছে করছে," বলে পা বাড়ায় এমিলি। সামা হাঁটতে থাকে পাশে। ইচ্ছের কারণটা বলতে লজ্জা করছে এমিলির। ওই নির্জন গলির গাছেরা ফুল নিয়ে পুজারীর মতো অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছে সামা, এমিলির জন্য। ওখান দিয়ে হেঁটে গেলেই ফুল পড়বে মাথায়। প্রেমের প্রতি প্রকৃতির সরল অকৃপণ আশীর্বাদ।

ছবি : প্রসেনজিৎ নাথ